মানব পাচারে প্রযুক্তির ব্যবহার

আল মামুন

সম্প্রতি গণমাধ্যমে এসেছে, বিদেশি নাগরিকের সঙ্গে মিথ্যা বিয়ের ফাঁদে পড়ে বাংলাদেশি নারীরা বিদেশে পাচারের শিকার হচ্ছেন।'টিকটক হৃদয়' নামের একজন মানব পাচারকারীর কথা আমরা জানি, যিনি দাবি করেছেন, তিনি একাই এক হাজার জনকে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পাচার করেছেন।এখন কিন্তু সেই হৃদয়ের জায়গায় অনেক হৃদয় যুক্ত হয়েছে। এখানে কেবল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষেরা এই ফাঁদে পড়ছে তা নয়, অনেক স্মার্ট তরুণ-তরুণী ও শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ফাঁদে পড়ছেন। আবার বাংলাদেশ থেকে উচ্চশিক্ষিত তরুণদের পাচার করে জোরপূর্বক সাইবার স্ক্যামিংয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। পাচারকারীরা এখন ফেসবুক, টিকটকের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে পাচারের টুল হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে। বাণিজ্যিক পরিসরে থাকা সামাজিক মাধ্যমগুলোর জন্য আমরা আমাদের দেশে এখনো কোনো দায়বদ্ধতার জায়গা তৈরি করতে পারিনি।

মানব পাচারের ধরন প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কোভিড–পরবর্তী সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ইন্টারনেটের বহুমুখী ব্যবহারের কারণে সাইবারভিত্তিক মানব পাচারের বেশ কিছু নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। প্রযুক্তির অপব্যবহার করে একটি অপরাধী চক্র অভ্যন্তরীণ, আন্তসীমান্ত বা আন্তদেশীয় মানব পাচারে সক্রিয় রয়েছে, যার প্রধান শিকার কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীরা। মানব পাচার যে কত বড় মানবাধিকার লঙ্ঘন, তা আমাদের দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করতে হবে, ধারণ করতে হবে। পাচারকরীদের সঠিক তথ্য বেশির ভাগ সময়ে সামনে আসে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তদেশীয় শ্রম পাচারের বিষয়টিকে যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অভ্যন্তরীণ পাচারকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু এখানেও শ্রম শোষণ, গৃহস্থালিতে জবরদস্তিমূলক শ্রম, যৌন শোষণ ও শিশুশ্রমের মতো নেতিবাচক চিত্র দেখা গেছে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে দালাল চক্র মেয়েদের অধিক উপার্জনের প্রলোভন দেখিয়ে বড় বড় শহরে অবৈধ ব্যবসায় যুক্ত করছে। আন্তসীমান্ত মানব পাচারের ক্ষেত্রেও এ প্রবণতা লক্ষণীয়।

যাকে আমরা মানব পাচার বলি, তার মধ্যে স্থানান্তর বা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কিন্তু যখন ডিজিটাল মাধ্যমের দ্বারা পাচার সংঘটিত হচ্ছে, তখন কিন্তু এ স্থানান্তরের প্রয়োজন অনেকাংশ হচ্ছে না। আমি এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গেলাম না; কিন্তু পাচার হয়ে গেলাম—বিদ্যমান আইন একে সমর্থন করে কি? পাচারকারীরা আমাদের অজান্তেই আমাদের ঘরের মধ্যেই অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে আমাদের দৃশ্য ও আচরণ দ্বারা অন্যের কাছে বিনোদনের সমাগ্রী হয়ে ওঠার সুযোগ তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে অর্থের আদান-প্রদান হচ্ছে। আমাদের ছবি প্রকাশ করে দেবে বলে আমাদেরকে আবদ্ধ করছে, অপহরণ করার প্রয়োজন হচ্ছে না। ভীতি ও ভালোবাসা—এ দুটিকে ব্যবহার করে তারা এ ফাঁদটা তৈরি করেছে। কাজেই কিশোর-কিশোরীদের এ জগতের গোলকধাঁধা সম্পর্কে তথ্য দিতে হবে,তাদের সচেতন করতে হবে যেন তারা সাবধান হতে পারে।

সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো লাইক পাওয়া, নিজেদের ফ্যান-ফলোয়ার বাড়ানো। তাই খুব সহজে কিশোর–কিশোরীদের ফাঁদে ফেলা যায়। শিশুরা কীভাবে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা একমাত্র দায়বদ্ধ থাকছে তাদের পিতামাতার ওপর, যাঁদের বেশির ভাগই এ জগৎ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না। কোন সাইটে শিশুরা প্রবেশ করতে পারবে, আর কোনটিতে পারবে না, তা পশ্চিমা দেশের অভিভাবকেরা অ্যাপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে; কিন্তু আমাদের এখানে এমন কোনো ব্যবস্থা নেই। থাকলেও তার প্রচার খুবই সীমিত। দেশে শিশুদের ডিজিটাল সুরক্ষারও উদ্যোগ রয়েছে, কিন্তু সামাজিক মাধ্যমের যে অবকাঠামো ও সেবাকাঠামোর মধ্যে শিশুরা বিচরণ করছে, জাতীয় পরিসরে তার কোনো পরিচয় বা নিবন্ধন না থাকায় তাকে শনাক্ত করা যাচ্ছে না।

সম্প্রতি পাচারের যেসব ঘটনা সম্পর্কে জানা যাচ্ছে তার ৪০ শতাংশ ভুক্তভোগীই ফেসবুক, টিকটকের মতো কোনো সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সংযুক্ত হয়েছিলো। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, যারা পাচারকারী অথবা পাচারকারী চক্রের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে, তারা তাদের কাজের ধরনে পরিবর্তন এনেছে। তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি চৌকস। তারা জানে কীভাবে ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট লুকাতে হয়। ফলে এখানে মামলার তদন্ত কার্যক্রম বেশি দূর এগোয় না। কারণ, ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট অনুসরণ করা প্রায়শই সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দেশের ডিজিটাল ফরেনসিক সক্ষমতাও সীমিত। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি, কিন্তু পাচারকারীরা অনেক এগিয়েছে। তারা অন্য দেশের সিম দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ খুলে ব্যবহার করে। ফলে তাদের ট্র্যাক করা সম্ভব হয় না। এতে বিচারিক প্রক্রিয়া ও তদন্ত বড়ভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। ১৪ বছরের মেয়েদের ২১-২৩ বছরের দেখিয়ে চাকরি দেওয়ার কথা বলে পাচার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মিথ্যা আইডি কার্ড বানানো হয়। এ চক্র এখন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ও ভারতের হোটেলগুলোয় অনেক বাংলাদেশি মেয়ে পাচারের শিকার হয়ে জোরপূর্বক অবৈধ কাজে যুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। এখানে চাহিদা ও জোগান অনেক বড়, তাই আঞ্চলিক পর্যায়ে এ বিষয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের সঙ্গে বেসরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করা জরুরি।

একজন পাচারকারীর প্রধান চাওয়া থাকে, তাকে যেন কেউ ট্র্যাক করতে না পারে। এজন্য তারা সামাজিক মাধ্যম ছাড়াও ডার্ক ওয়েব ব্যবহার করে থাকে, যেখানে ক্রোম বা সাধারণ কোনো ব্রাউজার দিয়ে ঢোকা যায় না। ওখানে ঢুকতে লাগবে টর ব্রাউজার। ডার্ক ওয়েবের কাজই হচ্ছে সবকিছু বেনামি করা, আইপি অ্যাড্রেস লুকানো, লোকেশন লুকানো, পরিচয় লুকানো। সাধারণভাবে অনেকেই হোয়াটসঅ্যাপ ও সিগন্যাল অ্যাপ ব্যবহার করে থাকে। হোয়াটসঅ্যাপে কী লেখা হচ্ছে , তা এনক্রিপ্টেড করা থাকে। ফলে তা না দেখা গেলেও আমার আইপি এবং আমি কোথা থেকে ব্যবহার করছি তা বের করা যায়। কিন্তু সিগন্যাল অ্যাপে তাও দেখা যায় না। তাদের মূলনীতি হচ্ছে জিরো ডেটা, অর্থাৎ কোনো ডেটাই তারা রাখে না।

ব্লকচেইন সম্পর্কে সকলেরই মোটামুটি ধারনা আছে। ব্লক চেইনে পুরো নেটওয়ার্ক আছে, কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে, তা ট্রেস করা যায়। পালানোর কোনো সুযোগ নেই। তাকে ট্র্যাক করা যায়। সে কোথায় যাচ্ছে, কোন রুটে যাচ্ছে, সব তথ্যই জানা থাকে পাচারকারীর। যাঁদের পাচার করা হয়, তাঁদের সবাই তো প্রযুক্তিগতভাবে সচেতন বা শিক্ষিত থাকে না, সে ক্ষেত্রে তাঁরা বুঝতেই পারে না এ বিষয়গুলো।

মানব পাচারে মানুষ পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১২ থেকে ৩৫ বছর বয়সীরাই মানব পাচারের বেশি শিকার হয়ে থাকে। সাইবারভিত্তিক মানব পাচারের ঘটনায় যেসব মামলা হয়, তার অধিকাংশই মানব পাচার আইনে করা হয় না। আন্তসীমান্ত পাচারের ক্ষেত্রে দুটি দেশ জড়িত থাকে। ফলে যখন কোনো অপরাধ সীমানা অতিক্রম করে, তখন তা সমাধান করা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য বড় একটি চ্যালেঞ্জ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনও মানব পাচারের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টারের তথ্য মতে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৭ লাখ মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। এ বিশালসংখ্যক জনসংখ্যা কোনো না কোনোভাবে মানব পাচারের ঝুঁকির মধ্যে থেকে যাচ্ছে।

তাহলে পাচার প্রতিরোধে করণীয় কী? এসব বিষয় প্রতিরোধ করতেও একই রকম প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব। প্রযুক্তি তো কেবল ক্রিমিনালরা ব্যবহার করতে পারে এমন না, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও ব্যবহার করতে পারে। পাচারের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথমে একটা দেশে নিয়ে রাখা হয়, পরে সেখান থেকে আরেক দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও অভিবাসনপ্রত্যাশীদেরও ট্র্যাক করতে পারে তিনি ঠিক জায়গায় যাচ্ছেন, নাকি তিনি পাচার হচ্ছেন। এমআইটিতে লিংকন ল্যাব নামের একটা ল্যাব আছে, যেখানে তারা বিজ্ঞাপনগুলোকে এআই দিয়ে বিশ্লেষণ করে বের করার চেষ্টা করে কোন বিজ্ঞাপনের পেছনে পাচারকারীরা আছে। শেষ কথা হচ্ছে, পাচার প্রতিরোধে আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরো সক্ষম ও আধুনিক করে গড়ে তোলার বিকল্প নাই।

অনেক বছর ধরে মানব পাচারের বিরূদ্ধে সচেতনতা তৈরিতে কাজ করছে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা। এটা অন্তহীন একটা প্রক্রিয়া।বিপদগুলো কোথায় হতে পারে,কিভাবে হতে পারে এবং পাচারকারীরা সাধারনত কি ধরনের কৌশল নিয়ে থাকে সেসব বিষয়ে মা–বাবা ও পরিবারকে সচেতন করা দরকার । পাচার কখনো থেমে নেই, আগে একভাবে হতো, এখন অন্যভাবে হচ্ছে। ভালো একটা জীবনের স্বপ্নে অনেক কিছু বুঝতে না পেরে তারা পাচারকারীদের ফাঁদে পড়ে। অভিভাবকেরা লাভের কথা ভেবে ঝুঁকিগুলো বিবেচনা করে না। তাদের বোঝাতে হবে, এর পরিবর্তে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে দক্ষ করে তুললে সে এর চেয়ে অনেক গুণ বেশি ফিরিয়ে দিতে পারবে। তাদের জন্য অনেকগুলো অপশন তৈরি করে অভিভাবকদের সে সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

যারা পাচারের শিকার তাঁরা পুরোপুরি অসহায়। সমাজে তাঁদের নতুন করে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো একটি বড় যুদ্ধের শামিল। সরকারের চেষ্টা রয়েছে। সরকার, উন্নয়ন সংস্থা ও গণমাধ্যমের ত্রিমুখী পার্টনারশিপ এখানে দরকার। গণমাধ্যমে নিয়মিতভাবে পাচারবিরোধী খবর তুলে আনতে হবে। সংবাদপত্রে অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন বেশি করে প্রকাশিত হওয়া দরকার, যেগুলো ভবিষ্যতে রেফারেন্স হিসেবে কাজে লাগবে। জনগনকে সচেতন করার মাধ্যমে মানব পাচারের মতো জঘন্য অপরাধকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

#

পিআইডি ফিচার